সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা: করণীয়

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আধুনিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তথ্য বিনিময়ের পাশাপাশি এটি মতপ্রকাশ, বিনোদন ও সমাজ গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ, বিনোদন, তথ্য সংগ্রহ, মতবিনিময় সবক্ষেত্রেই এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ মাধ্যমের নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অশ্লীলতা বা পর্নোগ্রাফির বিস্তার। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অশ্লীল কনটেন্ট শুধু ব্যক্তিগত মূল্যবোধকেই প্রভাবিত করে না, বরং এটি সামাজিক অপরাধ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও মানসিক বিকৃতি বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল ও অনৈতিক ব্যবহার বিশেষ করে অশ্লীলতা, যৌন চেহারা বা কণ্ঠস্বরের অপব্যবহার সমাজে নানান নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার মোকাবিলা করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা ও এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

“অশ্লীলতা” ও “আচরণ সীমা” ধারণাগত ভাবনায় “অশ্লীলতা” (obscenity, indecency) শব্দের মানে নির্ধারণ করা সহজ নয়। এটি নির্ভর করে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন ও নৈতিকতার ধাঁচ অনুযায়ী। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে; কোনো কনটেন্ট (লেখা, ছবি, ভিডিও, অডিও) যদি যৌনাঙ্গ, যৌন সম্পর্ক, নগ্নতা বা যৌন উদ্রেকমূলক উপাদান প্রকাশ করে এবং তা এমনভাবে উপস্থাপন করে যা শ্রোতা, দর্শক বা পাঠকের মনে অশ্লীল অনুভূতি জাগাতে পারে, তাহলে তা “অশ্লীল” বলা যেতে পারে। এছাড়া এমন কনটেন্ট যা “মন্দমনস্কতা, অনৈতিকতা, বিবর্জিত শালীনতা” প্রচার করে; যেমন গালিগালাজ, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ, অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচ গান, বিশ্লেষণহীন নগ্ন চিত্র এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

পৃথিবীর অনেক দেশে আইনসম্মতভাবে “অশ্লীলতা” সংজ্ঞায়িত হয়েছে। “যদি কোনো সাধারণ মনোধারক ব্যক্তি কোনো কনটেন্টকে যৌনভাবে উদ্দীপক হিসেবে দেখে এবং যা সমাজে নৈতিকভাবে গৃহীত হয় না, তাহলে তা “কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড” (community standard) নিয়মের ভিত্তিতে অশ্লীল” । তবে “অশ্লীলতা” ও “শোভনতা” এর মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম সীমানা রয়েছে। কিছু বিষয় একটি সমাজে অশ্লীল মনে হতে পারে, আবার সে বিষয়টি অন্য সমাজে ন্যায্য শিল্প বা সাহিত্য হিসেবেও গণ্য হতে পারে। অতএব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে।

সামাজিক নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (freedom of expression) একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। অনেক ক্ষেত্রে শিল্প, সৃষ্টিশীলতা ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা “বিস্মৃত” বা “চ্যালেঞ্জিং” উপাদান থাকতে পারে। তবে যে ক্ষেত্রে সেই উপাদান সমাজে অশ্লীলতা বয়ে আনে, অর্থাৎ মানুষের নৈতিক ও মানসিক ক্ষতি, সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্টকারী হয়, সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

কোনো কনটেন্ট যদি জনসাধারণকে ব্যভিচার বা অনৈতিক কার্যসাধনে প্রলুব্ধ করে, শিশু বা কিশোরকে অনুপযুক্ত প্রভাবিত করে, সামাজিক ন্যায্যতা ও নৈতিকতা বিনষ্ট করে, ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মানহানির কারণ হয়, তাহলে আইন ও নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা শুধু “ব্যক্তিগত নৈতিকতার” বিষয় নয় বরং “গুরুতর সামাজিক ও সাংগঠনিক” বিষয়ও।

চলমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রকৃতি বহুবিধ বিস্তৃত। দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়া অশ্লীলতা বা অনৈতিক কনটেন্টের একটি বিশাল মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এর কারণ প্রবল সাড়া, প্রতিক্রিয়া, দ্রুততা, গোপনীয়তার ভান এবং সীমিত বিধিনিষেধ।

এর প্রকৃতি ও ধরন হলো; নগ্ন বা আংশিক নগ্ন চিত্র বা ভিডিও। কোনো ব্যক্তি বা মডেল নগ্ন বা আংশিক নগ্ন অবস্থানে দেখা যায় এমন ছবি বা ভিডিও। যৌন সঙ্গম, সঙ্গমই সূচক (explicit sexual acts) চিত্রায়ন। যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা, মন্তব্য বা মেসেজ। গালিগালাজ, অশ্লীল শব্দ, যৌন উত্তেজক মন্তব্য, বর্ণনা। মেসেঞ্জার বা চ্যাটে যৌন কুপ্রস্তাব, হার assing, সেক্সটিং (sexual messaging)। অশালীন নাচ-গান, চ্যালেঞ্জ বা ট্রেন্ড প্রকাশ। নির্লজ্জ নাচ, চ্যালেঞ্জ ভিডিও যেখানে নাচ করণের মাধ্যমে প্রলোভনমূলক বিষয় উপস্থাপন করা হয়। গোপন ভিডিও বা ছবি প্রকাশ ও শোষণ। গোপনে ধারণ করা ছবিগুলি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা (revenge porn)। ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও মার্কেটিং কন্টেন্ট। বিক্রয় মূলক উদ্দেশ্যে যৌন উত্তেজক কনটেন্ট ব্যবহার করা (যেমন: যৌন ওষুধ, পণ্যের বিক্রিতে উত্তেজক বিজ্ঞাপন)। অশ্লীলতার প্রসার যেভাবে হয়ে থাকে; শেয়ার ও রিডিসট্রিবিউশন। এক ব্যক্তি কনটেন্ট শেয়ার করলে তা দ্রুত ভাইরাল হতে পারে, কপি বা পুনরায় প্রকাশ হতে পারে। রিমিক্স বা মিডিয়া ম্যানিপুলেশন। কোনো সাধারণ ভিডিও বা ছবিকে কেটে প্যাস্ট করে যৌন

প্রেক্ষাপটে বদলানো। ফিল্টার ও চ্যানেল। বিভিন্ন গ্রুপ, চ্যানেল বা পেজে পুরানো অশ্লীল বিষয়বস্তু সংরক্ষিত ও পুনরুদ্ধৃত হয়। অ্যালগরিদম বুস্টিং। অধিক "Engagement" (লাইক, শেয়ার, কমেন্ট) সৃষ্টি করতে এমন কনটেন্টকে অ্যালগরিদম স্বয়ং বুস্ট করে শীর্ষে তুলে দেয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তারের পেছনে বেশ কিছু কারণ ও চালক শক্তি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মূল কারণগুলো হচ্ছে; মনোদৈহিক প্রলোভন ও আকর্ষণ। যৌন প্রলোভন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। কিছু মানুষ এই প্রলোভনকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে দুর্বল মনোসংবেদনশীলতায় অশ্লীল কনটেন্ট বানায় এবং শেয়ার করে। আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির ইচ্ছা; কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অশ্লীলতা ভিত্তিক কনটেন্ট থেকে অর্থ আয় করে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞাপন রাজস্ব, পেইড সাবস্ক্রিপশন, বোনাস বা টিপস ইত্যাদি। অনুকরণ প্রবণতা (Trend / Viral Culture); যখন একটি অশ্লীল ভিডিও বা চ্যালেঞ্জ ভাইরাল হয়, অনেকেই অনুকরণ করতে চায় "ফেম" বা "ভাইরাল স্ট্যাটাস" এর আশায়।

এছাড়াও সামাজিক ও নৈতিক সংকটও একটি কারণ। যেখানে পারিবারিক শিক্ষা দুর্বল, নৈতিক শিক্ষা কম বা অসংগঠিত, সেখানে মানুষ সহজেই প্রলোভনপূর্ণ কনটেন্টের প্রতি আকর্ষণ প্রবণ হতে পারে। নিয়ন্ত্রণের অভাব ও অনুপ্রবেশ সংস্কৃতিও দেখা যায় এ ক্ষেত্রে। অনেক দেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনলাইন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ কঠিন। আইন জানানোর অভাব, মনিটরিংয়ের সীমাবদ্ধতা ও আইন প্রয়োগ অব্যবস্থাপনার কারণে অশ্লীল কনটেন্ট অপসারণ বা দমন করা কঠিন হয়ে থাকে। গোপনীয়তার ভান ও অননুমোদিত প্রকাশ। কোনো ব্যক্তি মনে করতে পারে সামাজিক মাধ্যমে গোপনীয়তা আছে। ফলে নিজের অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও আপলোড করতে সাহস পান। পরে সেই কনটেন্ট অন্য কারো দ্বারা অপব্যবহার হতে দেখা যায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার বিস্তার যেমন ব্যক্তিগত ক্ষতি ঘটাতে পারে, তেমনি সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। যার প্রভাব হলো; মানসিক ও আবেগিক ক্ষতি। অশ্লীলতা বা হিংস্রতা দেখলে দর্শক বা পাঠক বিব্রত, লজ্জা বা শোকে ভোগেন। যদি কারো গোপন ছবি বা ভিডিও প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তি মানসিক আঘাত, ট্রমা, সামাজিক কলঙ্ক ও হেনস্তার শিকার হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রবণতা, বিষণ্নতা, উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় হয়। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হতে পারে, অনৈতিকতা ও বিবেচনাহীন প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। পরিবার ও সামাজিক বন্ধন ভেঙে যেতে পারে। শিশু ও কিশোররা প্রলোভিত হতে পারে এবং তাদের মন ও আচরণ বিকৃত হতে পারে।

ব্র্যান্ড ইমেজ ও সামাজিক সম্মানহানি ঘটার ঘটনাও দেখা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অশ্লীল কনটেন্টে জড়িয়ে পড়ে, তার সামাজিক সুনাম ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশাগত জীবনে (নিয়োগ, বিশ্বাস, সম্মানহানি) নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আইনগত অভিযোগ, দায়বদ্ধতা বা মামলা হতে পারে। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। অশ্লীল কনটেন্টের উপস্থিতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইমেজ ও কার্যকারিতাকে পুনর্বিচার করতে বাধ্য করে। অনেকে এ মাধ্যমকে "নো-মানুষের স্থান" বলেও অভিহিত করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে । যা ব্যক্তিগত, পরিবার-স্তর, সামাজিক ও আইনগত পর্যায়ে অনুশীলন প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে করণীয় হলো; সচেতনতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো। নিজের মনকে অধিকতর শালীন ও নৈতিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা। স্পষ্টভাবে জানা, কী ধরনের কনটেন্ট গ্রহণযোগ্য এবং কী ধরনের অনৈতিক। নিজের অনলাইন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা। অশ্লীল বা সন্দেহভাজন লিঙ্ক এড়িয়ে চলা।

প্রাইভেসি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে গোপনীয়তা সঠিকভাবে সেট করতে হবে। ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও শেয়ার করার ক্ষেত্রে দলিল বা অনুমতির প্রতিজ্ঞা রাখা জরুরি। সন্দেহভাজন বা অননুমোদিত বন্ধুপত্র বা মানুষকে ফলো না করা। নিরাপদ শেয়ারিং ও মন্তব্য, মন্তব্য বা রিঅ্যাকশনে সংযম বজায় রেখে অশ্লীল মন্তব্য এড়িয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি নিরাপদ ব্রাউজার ব্যবহার, অশ্লীল সাইট ব্লক করার টুলস ইনস্টল করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের "কন্টেন্ট ফিল্টার" বা "নেগেটিভ কনটেন্ট ব্লকার" সক্রিয় রাখতে হবে।

পরিবার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যা করণীয় হতে পারে তা হলো, শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। বিদ্যালয় ও কলেজে "অনলাইন এথিকস ও নৈতিক ব্যবহার" বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা। পিতামাতা ও অভিভাবকরা সন্তানদের সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিক দিক আলোচনা করবেন। কিশোরদের জানিয়ে দিতে হবে, অনলাইন অশ্লীলতা তাদের মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সামাজিক ও সংগঠন পর্যায়ে করণীয়তা হলো; সচেতনতা ও ক্যাম্পেইন। সামাজিক আন্দোলন, মিডিয়া প্রচারাভিযান (রেডিও, টিভি, অনলাইন) চালাতে হবে, যাতে মানুষ জানতে পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার ক্ষতির দিক। শিক্ষার্থীদের, যুবসমাজকে, পাবলিক স্পেসে ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সচেতনতা বাড়াতে হবে। নিজস্ব মানদণ্ড ও গাইডলাইন তৈরি করা প্রয়োজন। সামাজিক পেইজ, গ্রুপ বা চ্যানেলগুলো তাদের নিজস্ব "কন্টেন্ট নীতিমালা" নির্ধারণ করবে যা অশ্লীল, মানহীন

কনটেন্ট বন্ধ করবে। গ্রুপ এডমিন ও মডারেটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত, কোন ধরনের পোস্ট অনুমোদন বা বন্ধ করা হবে সে বিষয়ে। সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয় তথা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP), সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি, সিভিল সোসাইটি একসঙ্গে কাজ করবে অশ্লীল কনটেন্ট বাধা দিতে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, মানবাধিকার সংস্থাগুলো মিলিতভাবে "সাইবার নিরাপত্তা ও নৈতিকতা" বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালাতে পারে।

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (Pornography Control Act, 2012) অনুযায়ী পের্ভিয়েট ও পারফ্লিক ছবি বা ভিডিও ছড়ানো, প্রকাশ করা, রাখা ইত্যাদিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইন অনুসারে, নগ্ন বা যৌন দৃশ্যাবলি প্রচার বা রাখা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে শাস্তি হতে পারে কারাদণ্ড ও জরিমানা।

পরবর্তীতে "ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, ২০১৮" তৈরি করা হয়েছিল অনলাইন অপরাধ নিরোধে। তারপরে এটি পরিবর্তন করে "সাইবার সিকিউরিটি আইন, ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনগুলিতে অনধিকারপ্রবেশ, নকল বা বিকৃত কনটেন্ট প্রকাশ, অপমানমূলক তথ্য প্রচার, গোপন তথ্য প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে সাইবার সিকিউরিটি আইনও বাতিল করে বর্তমানে "সাইবার সিকিউরিটি অর্ডিনেন্স, ২০২৫" প্রবর্তন করা হয়েছে। অশ্লীল, অপ্রত্যাশিত, অশ্লীল মেসেজ বা চ্যাট এলে মনিটরিং, রিপোর্টিং ও অপসারণ প্রক্রিয়া সহজতর করা প্রয়োজন। সরকারি বা আধাসরকারি "সাইবার নজরদারি বিভাগ" শক্তিশালী করতে হবে, যারা পর্যবেক্ষণ করবে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অবিলম্বে অশ্লীল কনটেন্ট অপসারণের প্রক্রিয়া থাকতে হবে। নাগরিকদের জন্য সহজ "রিপোর্টিং মডিউল" থাকা উচিত, যার মাধ্যমে একটি বাটন বা ফিচার যা ব্যবহার করে সহজেই কনটেন্ট রিপোর্ট করা যাবে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হতে হবে। অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি, প্রচার বা বিতরণে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্ল্যাটফর্ম সংস্থাগুলোকেও দায়বদ্ধ করা, যদি তারা দ্রুত অশ্লীল কনটেন্ট অপসারণ না করে। তাদেরকে জরিমানা বা বিধিনিষেধের মুখে রাখা যেতে পারে।

কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, যা মোকাবিলা করাও জরুরি। সাইবার অপরাধে প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন। লগ, সার্ভার ডেটা, আইপি ট্রেসিং ইত্যাদি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ চ্যালেঞ্জিং। এছাড়াও গ্লোবাল হোস্টিং, অফশোর সার্ভার ব্যবহৃত হলে তদন্ত জটিল হতে পারে। অনেক সময় "অশ্লীল" বলে যে কনটেন্ট নিষিদ্ধ করা হয়, সেটা আদৌ অপরাধ কি না, বিচার ও আইনগত সীমা স্পষ্ট নয়। আইন প্রয়োগে অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার হলে বাক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা, বিশেষ করে অনেক স্থানীয় প্রশাসন বা সংস্থার পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও মানবশক্তি নেই। ডিজিটাল নজরদারি ও মনিটরিংয়ে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা ব্যয়বহুল। দুর্নীতি ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবহারও এ ক্ষেত্রে বাধা হয় কখনো। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবাদী গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দিক থেকে দমনমূলকভাবে ব্যবহার হতে পারে। কখনোবা ক্ষমতাসীন পক্ষের বিরোধী কণ্ঠকে "অশ্লীল" উপাদানের অভিযোগে দমন করতেও দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া। মামলায় স্বচ্ছতা, ন্যায্য বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। দোষ প্রমাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদণ্ড রাখতে হবে। পাশাপাশি, প্রযুক্তির ব্যবহার করে কনটেন্ট ফিল্টার এবং অটোমেটেড সিস্টেম (মেশিন লার্নিং, AI) ব্যবহার করে অশ্লীল কনটেন্ট শনাক্ত করা যেতে পারে। এসব সিস্টেমকে নানাবিধ ভাষা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, স্ল্যাং, ইয়ারনিক্যাল শব্দ চিনতে সক্ষম করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠলেও এই মাধ্যম যদি অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মঞ্চ হয়ে ওঠে, তাহলে তার নেতিবাচক প্রভাব শিশু, কিশোর, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর প্রতিকূল হতে পারে। এই সমস্যা মোকাবিলা একমাত্র আইন বা প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। এটি সামাজিক আন্দোলন, নৈতিক সংস্কার ও সর্বস্তরের অংশগ্রহণের বিষয়। ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও রাষ্ট্র একত্রে কাজ করলে এবং সচেতন হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা কমিয়ে এনে একটি সুস্থ, নৈতিক ও সমৃদ্ধ সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব।

#

লেখক: গল্পকার, কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার।

পিআইডি ফিচার